بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)- এর ২৩শে জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি এখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সে সকল ঘটনা উপস্থাপন করব যা তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। মহানবী (সা.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কেমন মানে উপনীত ছিলেন এবং তাঁর সম্মানের প্রশ্ন এলে তিনি (আ.) কীভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন এ সম্পর্কে লেখরাম সংক্রান্ত ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একস্থানে বলেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লাহোর বা অমৃতসর স্টেশনে ছিলেন এমন সময় পন্ডিত লেখরামও সেখানে আসে এবং এসে তিনি (আ.)-কে সালাম করে। পন্ডিত লেখরাম যেহেতু আর্য সমাজীদের মাঝে অনেক বড় মর্যাদার অধিকারী ছিল তাই যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে ছিলেন তারা তিনি (আ.)-কে লেখরাম সালাম করতে এসেছে দেখে যারপরনাই আনন্দিত হন। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করেননি। তিনি (আ.) হয়ত দেখেন নি—এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যখন তাঁর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা হয় যে, পন্ডিত লেখরাম সাহেব সালাম করছেন, তখন তিনি উত্তেজনার আতিশয্যে বলেন, তার লজ্জা করে না? সে আমার মনিবকে গালি দেয় আর আমাকে এসে সালাম করে! এ কথার প্রতি তিনি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন নি যে, লেখরাম এসেছে। কিন্তু কোন বড় রঈস বা নেতার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পাওয়াই সাধারণ মানুষের কাছে অনেক বড় সফলতা। যখন এমন কোন মানুষ তাদের কাছে আসে তখন তারা খুব মনোযোগ সহকারে তার কথা শুনে কিন্তু কোন দরিদ্র মানুষ আসলে ভ্রুক্ষেপই করে না।

একই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) এক জায়গায় এভাবেও লিখেছেন, আর্যদের মাঝে লেখরামের যে সম্মান ছিল সে কারণে বড় বড় মানুষ তার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পাওয়াকে নিজের সম্মানের কারণ বলে মনে করত। কিন্তু হযরত মির্যা সাহেবের আত্মাভিমান দেখুন! পন্ডিত সাহেব স্বয়ং সাক্ষাৎ করতে আসে কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, আমার মনিবকে গালি দেয়া পরিত্যাগ করুক তখন আমি সাক্ষাৎ করব। এ ঘটনায় একদিকে যেখানে রসূলের জন্য আত্মাভিমানের পরিচয় পাওয়া যায় সেখানে এই শিক্ষণীয় দিকও রয়েছে যে, বড় লোকদের শুধু বড় হওয়ার কারণে সালাম করা বা এটি মনে করা যে, আমাদের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে—এ ধারণা সঠিক নয়। বরং দরিদ্রের সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা আবশ্যক। সত্যিকার অর্থে যা আবশ্যক তাহলো, আত্মাভিমান প্রদর্শন। যদি কোন বড়লোক আমাদের রসূল (সা.) সম্পর্কে অশোভন ভাষায় কিছু বলে তাহলে সে যত বড়ই হোক না কেন তাকে গুরুত্ব দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। যাহোক, এ বিষয়ের বিভিন্ন দিক এবং আঙ্গিক রয়েছে।

অনুরূপভাবে অপর একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, হযরত মির্যা সাহেবের নিজ সন্তানদের প্রতি ব্যবহার এত উন্নত মানের ছিল যে, একথা চিন্তাই করা যেত না যে, তিনি কোন সময় রাগও করতে পারেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন মনে করতাম, হযরত সাহেব কখনও রাগ করেন না। সন্তানদের প্রতি তাঁর ভালবাসার মান এত উন্নত ছিল যে, হযরত মৌলভী আব্দুল করিম সাহেব (রা.) হযরত মুসলেহ্

মওউদ (রা.)-এর কাছেই এটি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মির্যা সাহেব একবার বলেন, আমার পাঁজরে ব্যথা হচ্ছে, গরম শেক দেয়া হয়েছে কিন্তু উপশম হয়নি। পরিশেষে অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, তার পকেটে ইটের একটি টুকরা ছিল যার কারণে পাঁজরে ব্যথা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করা হয় যে, হুযূর! এটি আপনার পকেটে কীভাবে আসল? তিনি (আ.) বলেন, মাহমুদ আমাকে ইটের টুকরাটি দিয়ে বলেছিল যে, যত্ন করে রাখবেন। আমি আমার পকেটে রেখে দিয়েছি, যখন সে চাইবে তার হাতে তুলে দেব। হযরত মৌলভী আব্দুল করিম সাহেব (রা.) বলেন, আমি বললাম, আমাকে দিন, আমি আমার কাছে রেখে দিচ্ছি। তিনি (আ.) বলেন, না আমি নিজের কাছেই রাখব। এককথায় সন্তানদের প্রতি তাঁর এমন ভালবাসা ছিল যে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমাদের সবাইকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন এবং ভালবাসতেন। বিশেষ করে আমাদের সবচেয়ে ছোট ভাই মির্যা মোবারক আহমদের প্রতি তাঁর গভীর স্নেহ এবং ভালবাসা ছিল। আমরা মনে করতাম, তিনি (আ.) হয়তো এরচেয়ে বেশি আর কাউকে ভালবাসতে পারেন না; কিন্তু এই ভালবাসা মহানবী (সা.)-এর ভালবাসার ওপর কখনো প্রাধান্য পায়নি। এই স্নেহের পুত্র একবার যখন শৈশবের বুদ্ধির অভাবে মুখ থেকে এমন কোন শব্দ বের করে যা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মহিমার পরিপন্থী ছিল তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সজোরে তার দেহে আঘাত করেন।

এরপর আরো একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, লাহোরে আর্যদের একটি সভা হয়, হযরত মির্যা সাহেব (আ.)-কেও এতে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। জলসার ব্যবস্থাপকরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে কোন বাজে শব্দ ব্যবহার করা হবে না। কিন্তু সভায় চরম নোংরা গালি-গালাজ করা হয়। আমাদের জামাতের কয়েকজন সদস্যও এতে অংশগ্রহণ করে যাদের মাঝে হযরত মৌলভী নূর উদ্দীন (রা.)-ও ছিলেন, যাকে হযরত মির্যা সাহেব গভীর সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন শুনলেন যে, জলসায় মহানবী (সা.)-কে গালি দেয়া হয়েছে তখন তিনি মৌলভী সাহেবকে বলেন, আপনার আত্মাভিমান সেখানে বসে থাকা কীভাবে মেনে নিল? আপনি কেন সেখান থেকে উঠে চলে আসলেন না? তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এতটাই উত্তেজিত ছিলেন যে, মনে হচ্ছিল তিনি মৌলভী সাহেবের সাথে চিরতরে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। মৌলভী সাহেব বলেন, হুযূর! ভুল হয়ে গেছে। তিনি (আ.) বলেন, এটি কেমন ভ্রান্তি! মহানবী (সা.)-কে গালি দেয়া হবে আর আপনি সেখানে বসে থাকবেন? একইসাথে তিনি (রা.) এটিও বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সাথে আমিও সেখানে গিয়েছিলাম আর আমাকেও তিনি (আ.) কঠোরভাবে বকাঝকা করেন, তুমি সেখানে কেন বসে থাকলে?

অতএব আজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর যারা এই অপবাদ আরোপ করে যে, নাউযুবিল্লাহ! তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর চেয়ে নিজেকে বড় মনে করেন, প্রশ্ন হলো তারা কী আবেগ-অনুভূতির এমন বহিঃপ্রকাশ বা কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবে? হায় এই অপবাদ আরোপকারীরা যদি তিনি (আ.)-এর রসূল প্রেমের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করতো!

এরপর আব্দুল্লাহ্ আথমের সাথে যে ধর্মীয় বিতর্ক হয়েছিল তার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) লিখেন, জঙ্গে মুকাদ্দস পুস্তক যাতে আথম সংক্রান্ত বিতর্কটি ছাপা হয়েছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই বিতর্ক তখন সংঘটিত হয়েছে যখন তিনি (আ.) মসীহ্ মওউদ হবার ঘোষণা দিয়েছিলেন। আর মৌলভীরা এই ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল যে, তিনি কাফির আর এই ফতওয়া জারী করেছিল যে, তিনি 'ওয়াজেবুল ক্বতল' বা অবশ্যই হত্যাযোগ্য। তিনি (রা.)

১৯২৩ সনে এই ঘটনা বলছেন। যে নিরাপত্তা আজকে জামাত উপভোগ করছে, সেই যুগে এমন নিরাপত্তাও ছিল না। বরং সেই সময় গোটা জামাতের অবস্থা তেমনই ছিল যেমনটি কিনা আজকাল সে সকল স্থানে বসবাসকারী আহমদীদের, যেখানে স্বল্পসংখ্যক আহমদী বসবাস করে; আর সর্বত্র একই অবস্থা বিরাজমান ছিল। এমন পরিস্থিতিতে একজন অ-আহমদীর এক খ্রিষ্টানের সাথে মোকাবিলা হয়। জান্ডিয়ালার অ-আহমদীদের এই চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল। তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আমন্ত্রণ জানায় যে, আপনি আমাদের পক্ষ থেকে এই ধর্মীয় বিতর্ক বা মোবাহাসা করুন এবং তাদের মোকাবিলা করুন। তিনি (রা.) বলেন, একজন অ-আহমদীর খ্রিষ্টানদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। সেই অ-আহমদী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে অনুরোধ করে যে, আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামুন। আর এতে তিনি (আ.) তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হয়ে যান। তখন তিনি (আ.) একথা বলেননি যে, খ্রিষ্টানরা আমাদের ততবড় শত্রু নয় যতটা অ-আহমদীরা, কেননা খ্রিষ্টানরা হত্যার ফতওয়া দেয়নি কিন্তু সে সকল অ-আহমদী বা মৌলভীরা হত্যার ফতওয়া জারী করে রেখেছিল। কিন্তু যখন মহানবী (সা.)-এর সম্মান, ইসলামের সম্মান এবং আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ডাক আসে, যদিও তা অ-আহমদীদের পক্ষ থেকে ছিল, তিনি (আ.) মোবাহাসা বা বিতর্ক করার জন্য চলে যান এমনকি কাদিয়ানের বাহিরে যান। এটি তাঁর ঈমানী আত্মাভিমান ছিল যার জন্য তিনি কোন কিছুকে ভ্রুক্ষেপ করেন নি।

যাহোক, এটি এক দীর্ঘ মুবাহাসা বা ধর্মীয় বিতর্ক ছিল। এই বিতর্কের ব্যাপ্তি ছিল পনের দিন। শেষের দিকে তিনি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেন এবং একটি মানদন্ড নির্ধারণ করেন এবং একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, আজ রাতে আমার সামনে যা স্পষ্ট হয়েছে তাহলো, আমি যখন বিগলিত চিত্তে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করি যে, হে আল্লাহ! তুমি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দাও, আমরা তোমার দুর্বল বান্দা, তোমার সিদ্ধান্ত ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না। তখন তিনি শুভসংবাদরূপে এই নিদর্শন প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এই বিতর্কে উভয় পক্ষের মাঝে যে পক্ষ জেনে শুনে মিথ্যা বলছে আর সত্য খোদাকে পরিত্যাগ করছে সে বিতর্কের এই দিনগুলোর একেকটি দিনকে এক মাস হিসেব করে ১৫ মাসের ভেতর হাবিয়া দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে। সে ভয়াবহ লাঞ্ছনার মুখে পতিত হবে, শর্ত হলো, যদি সে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে। আর যে ব্যক্তি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য খোদাকে মানে এর মাধ্যমে তার সম্মান প্রকাশ পাবে। সত্য খোদার মান্যকারী তো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই ছিলেন। খ্রিষ্টানরা তো হযরত ঈসা (আ.)-কে খোদা বানিয়ে রেখেছিল আর এর পক্ষেই বক্র বিতর্ক করছিল। যাহোক, যেমনটি আমি বলেছি, এটি এক দীর্ঘ মুবাহাসা বা বিতর্ক ছিল আর এর পরিণাম কী হয়েছে তাও জগদ্বাসী দেখেছে। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দু'একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তা উপস্থাপন করছি।

এক জায়গায় বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) চাচড়া শরীফের খাজা গোলাম ফরীদ সাহেবের উল্লেখ করেন। ডেপুটি আব্দুল্লাহ্ আথম সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শাস্তি সংক্রান্ত যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার মেয়াদ অর্থাৎ পনের মাস কেটে যাওয়ার পরও যখন আথম মারা যায়নি তখন বাহ্যিকতার পূজারীরা হৈচৈ আরম্ভ করে যে, মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। একবার ভাওয়ালপুরের নবাব সাহেবের দরবারেও কিছু মানুষ হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে বলে, মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি আর আথম এখনও জীবিত আছে। তখন দরবারে চাচড়া শরীফের খাজা গোলাম ফরীদ সাহেবও উপস্থিত ছিলেন আর নবাব

সাহেব ছিলেন তার মুরীদ বা ভক্ত। কথায় কথায় নবাব সাহেবের মুখ থেকেও এই বাক্য বেরিয়ে আসে যে, হ্যাঁ মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি। এতে খাজা গোলাম ফরীদ সাহেব উত্তেজিত হয়ে যান এবং প্রতাপান্বিত কণ্ঠে বলেন, কে বলেছে আথম জীবিত। আমি তো তার লাশ দেখতে পাচ্ছি। তখন নবাব সাহেব নিরব হয়ে যান। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কিছু মানুষ বাহ্যত জীবিত মনে হলেও কার্যত তারা মৃত হয়ে থাকে। আর অনেককে বাহ্যত মৃত মনে হয় কিন্তু তারা কার্যত জীবিত হয়ে থাকে। যারা খোদা তা'লার পথে প্রাণ বিসর্জন দেয় তারা সত্যিকার অর্থে জীবিত হয়ে থাকে। আর আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অধিকারীরা জীবিতদের মাঝেও সহস্র সহস্র মৃত দেখতে পান। অর্থাৎ যারা বাহ্যত জীবিত কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অধিকারীরা তাদেরকে মৃত দেখতে পান। কোন বুযূর্গ সম্পর্কে লিখিত আছে যে, তিনি কবরস্থানে বসবাস করতেন। একবার তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি জীবিতদের ছেড়ে কবরস্থানে কেন এসে গেছেন? তিনি বলেন, শহরেতো আমি কেবল মৃতই দেখতে পাই আর এখানে জীবিত মানুষও চোখে পড়ে। অতএব আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত এবং মৃতদের শনাক্ত করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রকৃত মু'মিনের উচিত এ যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করা। যদি আধ্যাত্মিক দৃষ্টি থাকে কেবল তবেই জীবিত এবং মৃতের মাঝে পার্থক্য বোঝা যায় আর আমাদের সবারই সেই দৃষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা উচিৎ।

আব্দুল্লাহ্ আথম সম্পর্কে একথাও বলতে চাই, কেবল আধ্যাত্মিকভাবেই নয় বরং দৈহিক মৃত্যুরও সে শিকার হয়েছিল এবং তা ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হয়েছিল। হ্যাঁ এতে কিছুটা বিলম্ব ঘটেছিল ঠিকই তবে, তারও কিছু কারণ ছিল যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন।

পুনরায় আথম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মু'মিনের কাজ হল, খোদা তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করা। কাজতো আল্লাহ্ তা'লাই করেন, কিন্তু আমাদের দায়িত্ব হল, আমরা যেন তা-ই করি, তা-ই চিন্তা করি এবং তা-ই বলি যা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন। আমাদের তা-ই করা উচিৎ, ভাবা উচিৎ এবং বলা উচিৎ যা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন আথম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন আর ভবিষ্যদ্বাণীর মেয়াদ পার হয়ে যায়, তখন আমার বয়স ছয় বা সাত বছর ছিল; সেই দৃশ্য আমার খুব ভালভাবে মনে আছে। কাদিয়ানের যে যায়গায় বুক ডিপো ছিল এবং তার পাশের কক্ষে গাড়ি রাখা থাকত এবং তার পশ্চিমের কক্ষে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল পূর্বে দরস দিতেন বা রোগী দেখতেন। শেষের দিনগুলোতে মরহুম মৌলভী কুতুব উদ্দীন (রা.) সেখানে মানুষের চিকিৎসা করতেন। এর পাশে অপর একটি কক্ষ ছিল যাতে বিভিন্ন বই-পুস্তক রাখা ছিল। তখন সেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ছাপাখানা ছিল। আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) যে কক্ষে রোগী দেখতেন সেখানে বইয়ের ফর্মা প্রস্তুত করা হত এবং সেখান থেকে পরে বইগুলো অন্য কক্ষে রেখে দেয়া হত। যাহোক, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কতক ছাত্র বা শিষ্যও সেখানে থাকত। সে দিনগুলোতে মানুষের সংখ্যা ছিল অনেক কম, তাই সচরাচর যারা সেখানে আসত তারা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর শিষ্যত্ব বরণ করত। এটিই মাদ্রাসা ছিল আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-ই তাদেরকে পড়াতেন। এছাড়া আর কোন মাদ্রাসা সে সময় ছিল না। তারা তাঁর শিষ্যও ছিল এবং একইসাথে জামাতের খাদেমও ছিল। আমার খুব ভালভাবে স্মরণ আছে, আমি ছোট ছিলাম যখন আথম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর মেয়াদ পূর্ণ হয়।

খুবসম্ভব ৯৪ এর শেষ বা ৯৫ এর প্রথম দিকের কথা এটি। তখন আমার বয়স সাড়ে পাঁচ বা ছয় বছর ছিল। এখনও সেই দৃশ্য আমার স্মৃতিপটে অম্লান। তখন আমার জন্য এটি বোঝা সম্ভব ছিল না কেননা আমার বয়স ছিল খুবই কম। কিন্তু এখন ঘটনাবলী দৃষ্টে আমি বুঝতে পারি যে, যেদিন আথম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার শেষ দিন ছিল অর্থাৎ পনের মাস যেদিন শেষ হতে যাচ্ছিল সেদিন এত হট্টগোল হচ্ছিল যে, মানুষ চিৎকার করে কাঁদছিল আর দোয়া করছিল, হে আল্লাহ্! আথম ধ্বংস হোক। এটি আসর এবং মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ের কথা। এরপর নামাযের সময় হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নামায পড়ান এবং নামাযের পর তিনি মুসল্লীদের সাথে মজলিসে উপবিষ্ট হন। যদিও সেই বয়সে আমি রীতিমত মজলিসে উপস্থিত হতাম না কিন্তু কখনও কখনও বসে যেতাম। সেদিন আমিও বৈঠকে যোগ দেই। সেদিন যারা কেঁদে কেঁদে দোয়া করছিল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদের এই কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন, কোন মানুষের কী আল্লাহ্ তা'লার চেয়ে অধিক নিজের উক্তির জন্য আত্মাভিমান থাকতে পারে? আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু বলেছেন, এমনটি হবে তাই আমাদের ঈমান থাকা উচিৎ, এমনটি অবশ্যই হবে। আর আমরা যদি খোদা তা'লার কথা বুঝতে ভুল করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ভ্রান্তি অনুসারে সিদ্ধান্ত দিতে বাধ্য নন। যদি আমরা খোদা তা'লার কথা ভুল বুঝে থাকি তাহলে আমরা যেভাবে বুঝেছি সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত বা রায় দিতে আল্লাহ্ তা'লা বাধ্য নন। আমাদের কাজ হলো, সেই ব্যক্তির কথায় দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যাকে আমরা সত্যবাদী জ্ঞান করেছি। এককথায় মু'মিনের কাজ হলো, আল্লাহ্ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল করা বা নির্ভর করা। আল্লাহ্ তা'লার কথা অবশ্যই পূর্ণ হয়ে থাকে। আর আমি যেমনটি বলেছি, এই ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং বড় মহিমার সাথে পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু হ্যাঁ সাময়িকভাবে আব্দুল্লাহ্ আথমের তওবার কারণে এটি বিলম্বিত হয় কিন্তু অবশেষে সে ধরা পড়ে। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বেশ কয়েক স্থানে উল্লেখ করেছেন। তার মাঝ থেকে দু'একটি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

আথম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আমাদের জামাতের সদস্যদের স্মৃতিপটে এ কথা জাগ্রত থাকা চাই বা সদা স্মরণ রাখা চাই, আথমের অনুশোচনা বা প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে স্মরণ রাখতে হবে যে, ভবিষ্যদ্বণী শুনতেই সে নিজের জিহ্বা বের করে এবং নিজের কান ধরে আর কেঁপে উঠে এবং ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এক বিশাল জনগোষ্ঠীর সামনে তার এই অনুশোচনা এবং প্রত্যাবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। এরপর তার ওপর ভয় ছেয়ে যায় এবং সে শহরের পর শহরে আত্মগোপন করতে থাকে। সে বিরোধিতা পরিত্যাগ করে, এরপর ইসলাম বিরোধী আর কোন রচনা বা প্রবন্ধ প্রকাশ করেনি। যখন পুরষ্কারের ঘোষণা সম্বলিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাকে কসম খাওয়ার জন্য ডাকা হয় তখন কসম খেতেও আসেনি। আর সত্য সাক্ষ্য গোপনের অপরাধে সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, যা তার সম্পর্কে করা হয়েছিল, সে ধ্বংস হয়ে যায়। সত্য সাক্ষ্য গোপনের কারণে কিছুটা পরে হলেও সে ধ্বংস হয়েছে। ন্যায়পরায়ণ খ্রিষ্টানের সামনেও যদি একথাগুলো তুলে ধরা হয় তাহলে তিনিও একথা স্বীকার করবে। এক কথায় এভাবে বিষয়গুলোকে স্মৃতিপটে রাখা আবশ্যক আর বই-পুস্তক পাঠ করাও জরুরী বিষয়। এর জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই পড়লেই বুঝা যাবে।

অপর এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল শর্তসাপেক্ষ। সে ভীত-ত্রস্ত ছিল এবং শহর থেকে শহরান্তরে আত্মগোপন করতে থাকে। যদি তার প্রভু মসীহ্র ওপর তার বিশ্বাস থাকত এবং নির্ভর করত তাহলে এত ভীতি ও ত্রাসের কারণ কী? কিন্তু একই সাথে যখন

সে সত্য গোপন করেছে এবং এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে পথভ্রষ্ট করতে চেয়েছে; কেননা সত্য গোপন করা অনেক অজ্ঞের জন্য হোঁচট খাওয়ার কারণ হতে পারত তাই আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় সত্য প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমাদের শেষ বিজ্ঞাপনের সাত মাসের ভেতর তাকে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেন আর যে মৃত্যুর ভয়ে সে ভীত ছিল এবং পালিয়ে বেড়াচ্ছিল সেই মৃত্যুই তাকে গ্রাস করে। আমি বুঝিনা আথম সম্পর্কে মানুষের সমস্যা কোথায়? এত স্পষ্ট লক্ষণাবলী থাকা স্বত্ত্বেও এরা অস্বীকার করে! এমন জোরালো প্রমাণাদি থাকলে তো আদালত অপরাধীদের ফাঁসিও দিয়ে দেয়। বস্তুতঃ আথম সংক্রান্ত বিষয়টি অনেক বড় এক ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। আর বারাহীনে আহমদীয়ায় এ সম্পর্কে স্পষ্ট এবং পরিষ্কার ভাষায় ইলহাম রয়েছে।

পুনরায় একস্থানে এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, তাতে লেখা আছে যে, "শর্ত হল, যদি সে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে"। একথা লেখা নেই যে, "শর্ত হলো, যদি সে মুসলমান হয়ে যায়"। ইতোপূর্বে মহানবী (সা.)-এর জন্য সে নাঊযুবিল্লাহ্ দাজ্জাল শব্দ ব্যবহার করেছিল আর এটিই মোবাহিলার কারণ ছিল। কিন্তু এরপর আমি যখন ভবিষ্যদ্বাণী শুনালাম তৎক্ষণাৎ সে নিজের কান ধরে এবং বলে, তওবা তওবা আমি তো দাজ্জাল বলিনা। এরা বুঝেনা, কেবল খ্রিষ্টান বা প্রতিমা পূজারী হওয়ার কারণে পৃথিবীতে আযাব নাযিল হয় না। এমন আযাব বা শাস্তির জন্য কিয়ামতের দিন নির্ধারিত আছে। শাস্তি বা আযাব সর্বদা অহংকার বা ঔদ্ধত্যের কারণে নাযিল হয়। আবু জাহেলের মত লোকেরা যদি দুষ্কৃতির আশ্রয় না নিত তাহলে শাস্তি নাযিল হত না। কেবল মিথ্যা ধর্মের অনুসরণের কারণে কোন শাস্তিও আসে না আর কোন ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয় না। সবসময় অহংকার এবং ঔদ্ধত্যের কারণেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। তিনি আরও বলেন, মানুষ যত বড় মানুষ পূজারী বা প্রতিমা পূজারীই হোক না কেন যতক্ষণ দুষ্কৃতির আশ্রয় না নেয় ততক্ষণ শাস্তি আসে না। যদি এ সমস্ত কারণেই পৃথিবীতে শাস্তি নাযিল হতে আরম্ভ হয় তাহলে কিয়ামত দিবসে কী হবে? তিনি আরো বলেন, কাফিরদের জন্য আসল কারাগার হল কিয়ামত। সিদ্ধান্ত কিয়ামত দিবসেই হবে। এখন প্রশ্ন উঠে, তাহলে এই পৃথিবীতে আযাব বা শাস্তি কেন আসে? তিনি (আ.) এর সংক্ষিপ্ত উত্তরে বলেন, অহংকার বা ঔদ্ধত্যের কারণেই শাস্তি নাযিল হয়ে থাকে। পৃথিবীতে যে সকল আযাব আসে তা ঔদ্ধত্যের কারণেই আসে।

আব্দুল্লাহ্ আথমের সাথে বিতর্ক চলাকালে খ্রিস্টান মিশনারীরা ষড়যন্ত্র মূলক ভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নিজেদের ধারণা অনুসারে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। আর তারা এমন এক রীতি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেয় যারফলে মানুষের সামনে তিনি হেয় প্রতিপন্ন হন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাদের দুষ্কৃতি তাদের বিরুদ্ধেই বর্তিয়েছেন আর তারা ভীত-ত্রস্ত হয়ে যায় এবং এমন ত্রাস তাদের ওপর ছেয়ে যায় যে, যারা দেখেছে তারা বলেন, তাদের সেই ভীতি দেখার মত ছিল। এই বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র বরাতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি সেই সময় অল্প বয়স্ক বালক ছিলাম। খলীফা আউয়াল (রা.) বলতেন, আথম সংক্রান্ত মুবাহাসা বা বিতর্কে আমি যে দৃশ্য দেখেছি এর পূর্বে তো আমাদের বিবেক-বুদ্ধি সঠিকভাবে কাজ করছিল না কিন্তু এরপর আমাদের আনন্দের কোন সীমা রইল না। তিনি (রা.) বলেন, খ্রিস্টানরা যখন নিরূপায় হয়ে যায় এবং যখন তারা দেখল যে, তাদের কোন ষড়যন্ত্র সফল হচ্ছে না তখন কতিপয় মুসলমানকে সাথে নিয়ে তারা হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে যে দুষ্কৃতিমূলক কাজের আশ্রয় নেয় তাহলো, কয়েকজন অন্ধ, বধির এবং খোঁড়াকে সেখানে একত্রিত করে এবং বিতর্কের পূর্বে তাদেরকে একপাশে বসিয়ে রাখে। হযরত মসীহ্ মওউদ

(আ.) যখন সেখানে আসেন তৎক্ষণাৎ তারা সেই অন্ধ, বধির, খোঁড়া এবং হাত পা বিহীন লোকদেরকে তাঁর (আ.) সামনে উপস্থাপন করে এবং বলে যে, শুধু কথার মাধ্যমে বিবাদের মিমাংসা হবে না, অনেক বিতর্ক হয়েছে। আপনি বলেন, আমি ঈসা (আ.)-এর মসীল বা প্রতিচ্ছবি। আর ঈসা (আ.) অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি দিতেন, বধিরদের শ্রবণশক্তি দান করতেন আর হাত-পা বিহীন লোকদের হাত-পা বহাল করতেন। আমরা আপনাকে কষ্টের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কয়েকজন অন্ধ, বধির এবং হাত-পা বিহীন লোক একত্রিত করেছি। আপনি যদি সত্যিই মসীহ্‌র মসীল বা প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন তাহলে তাদের নিরাময়ের ব্যবস্থা করে দেখান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, তাদের এমন কথা শুনে আমরা মারাত্মক ভাবে ঘাবড়ে যাই। আমরা খুবই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। যদিও আমরা জানতাম, এটি একটি কথার কথা। কিন্তু আমরা এ কারণে ভীত ছিলাম যে, আজকে এরা হাসি-ঠাট্টা বা তিরস্কারের সুযোগ পাবে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র চেহারার দিকে যখন তাকালাম তখন তার পবিত্র চেহারায় ঘৃণা এবং ভীতির কোন লক্ষণই ছিল না। খ্রিস্টানরা যখন কথা শেষ করে তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, দেখুন পাদ্রী সাহেব! আমি যে মসীহ্‌র মসীল বা প্রতিচ্ছবি হওয়ার দাবী করি, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তিনি বাহ্যিকভাবে এমন অন্ধ, বধির, খোঁড়া এবং হাত-পা বিহীন লোকদের নিরাময় করতেন না। কিন্তু আপনাদের বিশ্বাস হল, মসীহ্ দৈহিকভাবে অন্ধ, বধির, খোঁড়া এবং হাত-পা বিহীন লোকদের আরোগ্য দান করতেন। এছাড়া আপনাদের কিতাব বাইবেলে এটাও লেখা আছে যে, যদি তোমাদের মাঝে তিল পরিমাণও ঈমান থাকে এবং তোমরা পাহাড়কে নিজের স্থান থেকে সরে যেতে বল তাহলে পাহাড় সেখান থেকে সরে যাবে আর আমি যেসব নিদর্শন প্রদর্শন করি অর্থাৎ ঈসা (আ.) বলছেন, সেই সমস্ত নিদর্শন তোমরাও প্রদর্শন করতে পারবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন, তাই এই প্রশ্ন আমাকে করার কোন যুক্তি নেই। আমি তো সেসব নিদর্শন বা মোজেযা প্রদর্শন করতে পারি যা আমার মনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রদর্শন করেছেন। আপনারা যদি সে সমস্ত নিদর্শনের দাবী করেন তাহলে আমি তা দেখানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছি। বাকি থাকলো এ ধরনের নিদর্শন। স্মরণ রাখবেন, আপনাদের গ্রন্থ স্বয়ং ঘোষণা করেছে, প্রত্যেক সেই খিষ্টান যার মাঝে সরিষার-দানা পরিমাণও ঈমান রয়েছে সেও একই ধরনের নিদর্শন দেখাতে পারবে যা মসীহ্ নাসেরী দেখিয়েছেন। তাই আপনারা খুব ভালো কাজ করেছেন, আমাদেরকে কষ্টের হাত থেকে রক্ষা করেছেন আর এই সকল অন্ধ, বধির, খোঁড়া আর হাত-পা বিহীন লোকদের এখানে একত্রিত করেছেন। এখন এই সকল অন্ধ, বধির, খোঁড়া এবং হাত-পা বিহীন লোকেরা এখানে আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনাদের মাঝে যদি এক তিল পরিমাণও ঈমান থেকে থাকে তাহলে এদেরকে ভাল করে দেখান। তিনি (রা.) বলতেন, এই উত্তর শুনে পাদ্রীরা এতটাই হতভম্ব হয়ে যায় যে, বড় বড় পাদ্রীরা সেসব খোঁড়া এবং হাত-পা বিহীন লোকদের সেখান থেকে টেনে অন্যত্র নিয়ে যেতে থাকে। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লা তার নৈকট্যপ্রাপ্তদের সকল ক্ষেত্রে সম্মান দিয়ে থাকেন আর তাদেরকে এমন সব উত্তর শিখিয়ে থাকেন যা শুনে শত্রুরা হতবাক হয়ে যায়।

এক ব্যক্তি যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ)-এর অনেক বড় ভক্ত ছিল কিন্তু পরবর্তীতে সে মুরতাদ হয়ে যায়, তার সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, লুধিয়ানায় মীর আব্বাস আলী নামে এক ব্যক্তি ছিল যার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি গভীর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা ছিল। এমনকি তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি

ইলহামও হয়েছিল। লুধিয়ানায় যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীর মাঝে বিতর্ক হয় তখন মীর আব্বাস আলী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোন বার্তা নিয়ে যায়। মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন এবং বড় বড় মৌলভীরা খুবই শ্রদ্ধা এবং সম্মানের সাথে তার হাতে চুমু খায় এবং বলে, আপনি রসূলের বংশ, আপনার হাতে আমরা বয়আত করার জন্যও প্রস্তুত রয়েছি কিন্তু এই মোগল কোথা থেকে আসলো। যদি কোন মা'মুর আসার থাকতো তাহলে সৈয়্যদদের মধ্য থেকে আসা উচিৎ ছিল। এরপর তারা তাসাউফ বা সূফী মতবাদ এবং সূফীদের সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করে দেয়। মীর সাহেবের যেহেতু সূফীদের প্রতি গভীর ভক্তি ছিল তাই মৌলভীরা এদিক-সেদিকের কিছু কাহিনী উল্লেখ করে বলে, সূফীরা এ ধরনের বিস্ময়কর বিষয়াদি প্রদর্শন করে থাকেন— এরা বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে। যদি মির্যা সাহেবের ভেতরেও কিছু থেকে থাকে তাহলে তারও এমন বিস্ময়কর কিছু প্রদর্শন করা উচিত। তাহলে আমরা আজই তাকে গ্রহণ করবো। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তার উচিৎ কোন কোন সাপ ধরে দেখানো বা এ ধরনের অন্য কোন অতিপ্রাকৃতিক কাজ করা। মীর আব্বাস আলীর হৃদয়ে একথাগুলো গ্রথিত হয়ে যায় এবং তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এসে বলেন, হুযুর যদি কোন কেরামত দেখান তাহলে সব মৌলভী আপনাকে গ্রহণ করবে। মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, মীর সাহেবের মুখ থেকে কেরামত শব্দ বের হওয়া মাত্রই আমি নিশ্চিত হয়ে যাই যে, মীর সাহেবকে মৌলভীরা ফাঁদে ফেলেছে। তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে অনেক বুঝিয়েছেন কিন্তু তিনি কিছুই বুঝতে পারেন নি আর এর ফলশ্রুতিতে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং যে নিষ্ঠা ও ভালবাসা ছিল তার সবই ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে।

একই ঘটনা অর্থাৎ মীর আব্বাস আলী সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে লুধিয়ানার মীর আব্বাস আলী সাহেব সম্পর্কে সাময়িক জ্ঞান দেয়া হয়েছিল যে, তিনি পুণ্যবান। যেভাবে পূর্বে বলা হয়েছে, তার সম্পর্কে ইলহামও হয়েছে। মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন এর ভিত্তিতে তার প্রশংসা শুরু করেন। কিন্তু সেসময় তিনি (আ.) যেহেতু তার পরিণতি সম্পর্কে জানতেন না তাই তিনি বুঝতে পারেন নি যে, একদিন সে মুরতাদ হয়ে যাবে। কিন্তু পরবর্তীতে খোদা তা'লা তাঁকে সেই জ্ঞান দান করেন। বস্তুতঃ মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত। শুধু আল্লাহ্ তা'লাই পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন যা সর্বব্যাপী। খোদার জ্ঞানকে কেউ আয়ত্ত করতে পারে না। নবীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা যতটা অবহিত করেন তাঁরাও মানুষকে ততটাই অবহিত করে থাকে।

একই মীর সাহেব সংক্রান্ত আরও কিছু কথা রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি মীর সাহেব সম্পর্কে ইলহাম হয়েছে, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি গভীর ভালবাসা রাখতেন। একবার ইলহাম হয়, যাতে তার আধ্যাত্মিক শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করা হয় কিন্তু পরবর্তীতে সে মুরতাদ হয়ে যায়। এতে করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে কিছু মানুষ আপত্তি করে যে, এর সম্পর্কে তো আল্লাহ্‌র ইলহামে প্রশংসা রয়েছে, এ ব্যক্তি কেন মুরতাদ হল? তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, নিঃসন্দেহে ইলহামে তার প্রশংসা করা হয়েছিল এবং আল্লাহ্ তা'লার ইলহাম বলেছিল যে, তার ভেতরে উন্নত আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল কিন্তু যখন সে সেসব শক্তির অপব্যবহার করেছে এবং তার মাঝে অহংকার ও ঔদ্ধত্য দানা বেঁধেছে তখন খোদার ক্রোধ তার ওপর বর্ষিত হয় এবং সে মুরতাদ হয়ে যায়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সূরা ফাতিহার দোয়াও আমাদের একথা বলে যে, মুনাফিকত এবং কুফর এই দু'টি ব্যাধি সবসময় মানুষের সাথে লেগেই থাকে আর এ দু'টি ব্যাধি নিয়ামতপ্রাপ্ত শ্রেণীর

অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর মানুষের ওপর আক্রমন করে। আল্লাহ্ তা'লা যাদের ওপর নিয়ামত বর্ষণ করেন, সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর এগুলো তাদের ওপর হামলা বা আক্রমন করে। এর প্রমাণ হল, সূরা ফাতিহায় যে ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের উল্লেখ রয়েছে, নিয়ামত-প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর তারা এই পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। যদি নিয়ামত-প্রাপ্ত শ্রেণী নিজেদের যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি না করে বা না বুঝে তাহলে অহংকারের কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অভিশপ্ত বা পথভ্রষ্টদের শ্রেণীভুক্ত করে দেন। তাই একথা সবসময় স্বরণ রাখা উচিত যে, সূরা ফাতিহার শেষে পাপ থেকে মুক্ত থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'লা যে দোয়া শিখিয়েছেন তাতে এই দোয়া সবসময় স্বরণ রাখা উচিত, আল্লাহ তা'লা যেন আমাদের সর্বদা নিয়ামত-প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত রাখেন আর এর ক্ষতিকর দিক যেন আমাদের জীবনে কখনো প্রকাশ না পায়।

বাহ্যিক জ্ঞানের ওপর নেকী বা বুযূর্গির ভিত্তি রাখা যায় না এ সম্পর্কে তিনি (রা.) অপর এক জায়গায় বলেন, যদি বাহ্যিক জ্ঞানের ওপরই শ্রেষ্ঠত্ব এবং বুযূর্গির ভিত্তি রাখা হয় তাহলে নাউযুবিল্লাহ পৃথিবীর সকল নবীকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করতে হবে কেননা, আলেমরাই তাদের বিরুদ্ধাচরণকারী হয়ে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধিতায় এমন মানুষই দন্ডায়মান হয়েছে যারা বাহ্যিক জ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে নিজেদের অনেক বড় আলেম মনে করতো। এমনকি মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী চরম তাচ্ছিল্যের সুরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য মুন্সী গোলাম আহমদ শব্দ ব্যবহার করত। নাউযুবিল্লাহা! তিনি (আ.) যেন কেবল একজন মুন্সী বা কেরানী, যিনি দু'চারটি লাইন লিপিবদ্ধ করতে পারেন মাত্র, তিনি আলেম নন। আর এটি করে সে আনন্দে বগল বাজাত যে, আমি তাঁর জন্য মুন্সী শব্দ ব্যবহার করেছি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) আরও বলেন, আমি তখন ছোট ছিলাম যখন মৌলভী সৈয়্যদ মুহাম্মদ আহসান সাহেব আমরোহী কোন এক অধিবেশনে বলেন, মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী আমার জন্য মৌলভী শব্দ ব্যবহার করেছে কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য মুন্সী শব্দ ব্যবহার করেছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি ছোট বয়সেও তাঁর অধিবেশনে একথা বর্ণনা করা অপছন্দনীয় ছিল আর এখনো এ কথাটি আমার অপছন্দনীয়। যাহোক, মান্যকারীদের উচিৎ সঠিক শব্দ নির্বাচন করা বা কিছু ঘটনা এমন হয়ে থাকে যা এভাবে বর্ণনা করার কোন প্রয়োজনই হয় না।

সত্য বলা সম্পর্কে আমরা অনেক ঘটনা শুনে থাকি। এখন আমরা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর ভাষায়ও শুনে নেই। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত ঘটনা, একবার তিনি (আ.) কোন একটি প্যাকেটে একটি চিঠি রেখে দেন যা ডাক বিভাগের আইন অনুয়ায়ী নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু তিনি (আ.) এটি জানতেন না। ডাক বিভাগের লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আর এই মামলা পরিচালনার জন্য বিশেষ কর্মকর্তা নিযুক্ত করে যেন তাঁর শাস্তি হয়। আর একথার ওপর খুবই জোর দেয়, অবশ্যই তার শাস্তি পাওয়া উচিৎ যেন অন্যরা সাবধান হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উকিল তাঁকে বলেন, বিষয়টি খুব সহজ। আপনার প্যাকেট সাক্ষীদের সামনে খোলা হয়নি। আপনি বলে দিন যে, আমি পত্র পৃথক পাঠিয়েছি, দুষ্কৃতি ও শত্রুতা বশতঃ বলা হচ্ছে যে, আমি প্যাকেটেই পত্র দিয়েছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এটি তো মিথ্যা হবে। উকিল বলে, এছাড়া আপনার নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই। তিনি (আ.) বলেন, যাই হোক না কেন মিথ্যা আমি বলতে পারব না। আদালতে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনি কী প্যাকেটে চিঠি রেখেছিলেন? তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উত্তরে বলেন, হ্যাঁ আমি চিঠি দিয়েছিলাম কিন্তু ডাক বিভাগের

এই নিয়মের কথা আমার জানা ছিল না। তখন বাদীর পক্ষ থেকে দীর্ঘ বক্তৃতা করা হয় আর বলা হয় যে, এর অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিৎ যেন অন্যদের জন্য এটি শিক্ষণীয় বিষয় হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, বক্তৃতা যেহেতু ইংরেজীতে ছিল তাই আমি আর কিছু বুঝি নি, কিন্তু বিচারক যখন বক্তৃতা সম্পর্কে 'নো' 'নো' বলতেন তখন সেই শব্দ আমার বোধগম্য ছিল। অবশেষে বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর বিচারক ঘোষণা করেন, সে নির্দোষ এবং আরো বলেন, তিনি যেহেতু এভাবে সব সত্য কথা বলেছেন তাই তাকে নির্দোষ ঘোষণা করছি। এই ঘটনা আমাদের অনেকেই অনেক বার পড়েছে এবং শুনেছে। আমিও বেশ কয়েক স্থানে এটি বর্ণনা করেছি। কিন্তু আমরা কেবল শুনে সেটি উপভোগ করি। সত্যের মান কীরূপ হওয়া উচিৎ এটি তার খুব ছোট্ট একটি দৃষ্টান্ত যা তিনি (আ.) আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু যারা নিজেদের স্বার্থের জন্য সত্যের প্রকৃত মান হতে অধঃপতিত তাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিৎ। এসব দেশে সরকারী সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য, অভিবাসনের জন্য বা ইন্সুরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের জন্য ভ্রান্ত রীতি অনুসরণ করা হয়। যারা এ ধরনের আচার-আচরণ করে থাকে এমন আহমদীদের ভাবা উচিৎ। অন্যায়ভাবে জাগতিক স্বার্থ সিদ্ধি করা কোন ভাবেই এক আহমদীর সাজে না।

জাদুটোনা বৈধ কি না? অনেক সময় মানুষ এতে অনেক বেশি জড়িয়ে থাকে। তিনি (রা.) লিখেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সবসময় হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সম্বন্ধে বলতেন, তাঁর মাঝে অন্যান্য সাহাবীদের তুলনায় ধর্মীয় বুৎপত্তি কম ছিল। মৌলভীরা এটি শুনে অনেক হৈচৈ শুরু করে দেয় কিন্তু যা সঠিক কথা তা সঠিকই হয়ে থাকে। আজকাল খ্রিষ্টানদের কাজে আসে বা তাদের সমর্থনে যত হাদীস পাওয়া যায় তার সব হাদীসই হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। এর কারণ হচ্ছে, তিনি প্রসঙ্গ দেখতেন না আর আলোচনার কিছু অংশ পুরোপুরি না বুঝেই বর্ণনা করে দিতেন। কিন্তু অন্যান্য সাহাবী প্রসঙ্গ বুঝে হাদীস বর্ণনা করতেন। অনুরূপভাবে এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে বিভিন্ন রওয়ায়েত ছাপা আরম্ভ হয়েছে, যার কতক এমন মানুষের পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হয় যাদের ধর্মীয় বুৎপত্তি নেই। সেই কারণে এমন অনেক বিবরণ ছাপা হয়ে যায় যে, এর ভিত্তিতে মানুষ আমাদের সামনে আপত্তি করা শুরু করে। যেমন একবার এই রেওয়ায়েত ছাপা হয়ে যায় যে, আথম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার যখন কেবল একদিন বাকী ছিল তখন তিনি (আ.) নাকি কিছু লোককে বলেন, তারা যেন এই পরিমাণ ছোলাবুটের ওপর এতবার অমুক সূরা পাঠ করে তাঁর কাছে নিয়ে আসে। ওযিফা বা দোয়া পড়ে যখন সেই ছোলাবুট হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিয়ে আসা হয় তিনি সেগুলো কাদিয়ানের বাইরে নিয়ে যান এবং একটি পরিত্যক্ত কূপে নিক্ষেপ করে দ্রুত সেখান থেকে ফিরে আসেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার সামনে যখন এ সংক্রান্ত আপত্তি উত্থাপন করা হয় তখন আমি ঘটনার বর্ণনাকারীকে জিজ্ঞেস করলাম, এই রেওয়ায়েত কেন লিখেছেন? এটিতো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রকাশ্য রীতি-নীতি এবং আমলের পরিপন্থী। এর অর্থ হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও নাঊযুবিল্লাহ্ জাদুটোনা করতেন। এ সম্পর্কে তদন্তের পর জানা গেছে, কোন ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দেখেছিল আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সামনে যখন সেই স্বপ্নের উল্লেখ করা হয় তখন তিনি (আ.) বলেন, বাহ্যিক অর্থেই স্বপ্ন পূরণের ব্যবস্থা কর। স্বপ্ন পূরণের জন্য একটি কাজ করা ভিন্ন কথা আর জেনেশুনে এমন কাজ করা ভিন্ন বিষয়। আর অনেক সময় বাহ্যিক অর্থে স্বপ্ন পূরণের ব্যবস্থা এজন্য করা হয়, যাতে খোদা চাইলে এর

ক্ষতিকর দিক যেন আক্ষরিকভাবে প্রকাশ না পায়। স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীরা লিখেছেন, ভীতিকর স্বপ্নও যদি বাহ্যিক অর্থে পূরণ করা হয় তাহলে সেই স্বপ্ন আর পূর্ণ হয় না; বাহ্যিকভাবে এটি পূর্ণ হওয়াকেই আল্লাহ্ যথেষ্ঠ মনে করেন। এর দৃষ্টান্তও আমরা হাদীসে দেখতে পাই। মহানবী (সা.) দেখেছেন যে, সুরাকা বিন মালেকের হাতে কিসরার স্বর্ণের কঙ্কণ রয়েছে। এই স্বপ্নে একদিকে যদি এই দিকে ইঙ্গিত থাকে যে, ইরান মুসলমানদের হস্তগত হবে, আমরা এ অর্থই করে থাকি, সেখানে অপরদিকে এ ইঙ্গিতও রয়েছে, ইরান জয়ের পর ইরানীদের পক্ষ থেকে কিছু সমস্যাও মাথাচাড়া দেয়া অবধারিত; কেননা স্বপ্নে যদি স্বর্ণ দেখা হয় তাহলে এর অর্থ হলো, দুঃখ এবং সমস্যা। হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর স্বপ্নের এই অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন আর তাই তিনি সুরাকাকে ডেকে বলেন, কঙ্কণ পরিধান কর নতুবা আমি তোমাকে চাবুকাঘাত করবো। পুরুষদের স্বর্ণের কঙ্কণ পরিধান করা নিষেধ। এটি কেবল মহানবী (সা.)-এর কথা পূর্ণ করার জন্যই নয় বরং এজন্যও করা হয়েছিল যে, যদি এতে কোন ক্ষতিকর দিক থাকে তাহলে তা যেন টলে যায়। এ কারণেই হযরত উমর (রা.) তাকে কঙ্কণ পরিয়েছেন। তাকে স্বর্ণের কঙ্কণ পরানো হয় আর এভাবে হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর এই স্বপ্নে নিহিত উৎকণ্ঠা ও দুঃশ্চিন্তামূলক দিক দূর করার চেষ্টা করেছেন। কাজেই, প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে যদি এভাবে কথা বলা হয় তাহলে এটি অনেক সময় সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে।

একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি খুতবা দেন। তাতে তিনি জামাতের সদস্যদের নসীহত করেন, ঝগড়া-বিবাদ পরিহার কর; ১৯৩১ সনের কথা এটি। জামাত এখন সাবালক হয়ে গেছে। তাই আমাদের নিজেদের, ঈমান ও কর্মকে ধর্মীয় জ্ঞানসম্মত বানানো উচিৎ। ধর্ম যে শিক্ষা দেয় সেই শিক্ষার অধীনস্ত হওয়া উচিৎ। খুতবায় একথা বলার পর তিনি (রা.) এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, ওমুক কারণে এ ব্যক্তিকে এখন জামাত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। খুতবার পর যখন সানী খুতবা শুরু হয় তখন খুতবা চলাকালেই এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, হুযূর! যে ব্যক্তিকে বহিষ্কার করা হয়েছে তার নাম কী? তখন আরেকজন বলেন, খুতবা চলাকালে কথা বলা উচিৎ নয়। এটি দেখে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মুচকি হাসেন। এরপর তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের একটি ঘটনা শোনান। কোন বৈঠকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর (বাড়ী) তল্লাশী সংক্রান্ত ঘটনা শোনাচ্ছিলেন। পন্ডিত লেখরামের হত্যার ঘটনায় গুরুদাসপুরের পুলিশ সুপার এ তল্লাশী চালিয়েছিল। তিনি (আ.) বলেন, পুলিশ সুপার একটি ছোট্ট দরজা অতিক্রম করতে গেলে তার মাথায় ভীষণ আঘাত পায়। সে দরজার চৌকাঠে বাড়ি খায় আর তার মাথা ঘুরে যায়। আমরা তাকে দুধ পান করতে বলি কিন্তু সে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে, এখন আমি তল্লাশীর জন্য এসেছি। এটি আমার ওপর অর্পিত দায়িত্বের পরিপন্থী কাজ হবে; হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সে এই উত্তর দেয়। তখন এই একই ব্যক্তি যার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যাকে জামাত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে তার নাম কী? তিনিই তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রশ্ন করেন যে, হুযূর! তার মাথা থেকে কী রক্ত বেরিয়েছিল? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হাসেন এবং বলেন, আমি তার টুপি খুলে দেখিনি।

এভাবে বিনা কারণে অনেক মানুষের কথা বলার অভ্যাস থেকে থাকে। যাহোক, খুতবার সময় কথা বলা নিষেধ। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি নসীহত করেছেন যে, খুতবার সময় কথা বলা নিষেধ তার আচরণও ভুল ছিল। ইশারা করা যেতে পারে বা পরে বুঝানো যেতে পারে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এরপর আরও একটি কৌতুক শোনান, এক ব্যক্তি

মসজিদে আসে। বাজামাত নামায চলছিল। সে উচ্চস্বরে সালাম দেয়। তখন নামাযীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি একইস্বরে ওয়া আলাইকুম সালাম বলে বসে। এতে তার সাথে যে নামাযী দন্ডায়মান ছিল সে বলে উঠে, তুমি কী জাননা যে, নামাযে কথা বলতে হয় না। তুমি উত্তর কেন দিলে? যাহোক, স্মরণ রাখা উচিৎ খুতবাও নামাযের অংশ। তাই খুতবা চলাকালে কথা বলা নিষেধ। কোন স্থানে কাউকে যদি বাঁধা দিতেই হয় তাহলে ইমাম যিনি খুতবা দিচ্ছেন তিনি বলতে পারেন। আর নামাযের সময়তো ইমামও কথা বলতে পারেন না। ঘরে এখন থেকেই সন্তানদের তরবীয়ত করা উচিৎ যেভাবে নামাযে কথা বলা নিষেধ একইভাবে খুতবার সময়ও কথা বলা নিষেধ।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।